পশ্চিমবঙ্গের নদীপরিচয়

কল্যাণ রুদ্র

আমাদের বাংলা নদীমাতৃক। ২২টি নদী অববাহিকা আর তাদের অসংখ্য উপনদী ও শাখানদী ছড়িয়ে আছে বাংলার বুক জুড়ে। এই সব ছোট ছোট নদী অববাহিকাগুলি তিনটি বড় নদী অববাহিকার অন্তর্গত। এই তিনটি অববাহিকা হল— গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও সুবর্ণরেখা। পশ্চিমবঙ্গের সব ছোট-বড় নদী এই তিনটি মূল নদীর উপনদী বা শাখানদী। প্রায় সাত কোটি বছর ধরে এই সব নদীর বয়ে আনা পলি সঞ্চিত হয়ে তৈরি হয়েছে এই সুজলা-সুফলা বাংলা।

১৯৪৭ সালে আমরা স্বাধীনতা পেলাম। কিন্তু ভাগ হয়ে গেল আমাদের মাতৃভূমি। অবিভক্ত বাংলার পশ্চিম অংশ পশ্চিমবঙ্গ নামে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হিসাবে পরিচিত হলেও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করল। লক্ষণীয়, দুই দেশের মধ্যে যে সীমারেখাটি অঙ্কিত হল তা ভাগ করে দিল আমাদের নদী ব্যবস্থাকেও। ফলে তিস্তা, গঙ্গা ইত্যাদি নদীগুলির জল ভাগাভাগি নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বিস্তর মতান্তর দেখা দিল। আমাদের জানা প্রয়োজন যে ৫৪টি নদী পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

ভাগীরথী হুগলি নদী ও তার উপনদী

রাজমহল পাহাড় পেরিয়ে গঙ্গা পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় প্রবেশ করেছে। এখান থেকে প্রায় ৮০ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বয়ে যাওয়ার পর ফরাক্কায় গঙ্গার বুক চিরে তৈরি হয়েছে ফারাক্কা ব্যারেজ। ফারাক্কা থেকে আরও ৪০ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে মুর্শিদাবাদ জেলার মিঠিপুর গ্রামে গঙ্গা দুটি ধারার বিভক্ত হয়েছে। মূল ধারাটি পদ্মা নামে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর আরও প্রায় ৬০ কি.মি. প্রবাহিত হয়ে জলঙ্গির পর বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। মিঠিপুর থেকে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকায় ধারাটি দক্ষিণ দিকে প্রায় ৫০০ কি.মি. প্রবাহিত হয়ে গঙ্গাসাগরে বিলীন হয়েছে। মিঠিপুর থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত ২৮০ কি.মি. গতিপথের নাম ভাগীরথী আর দক্ষিণে ২২০ কি.মি. দীর্ঘ অংশের নাম হুগলি। একসাথে নদীটিকে ভাগীরথী-হুগলি বলা হয়। উল্লেখ্য, এই নদীতে নবদ্বীপ পর্যন্ত অংশে জোয়ার-ভাটা খেলা করে।

ভাগীরথী-হুগলি নদীর সঙ্গে সাতটি উপনদী এসে মিশেছে। এই নদীগুলি হল—

বাঁশলোই, পাগলা, ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, হলদি, রসুলপুর ও পিছাবনি।। এছাড়া, খড়ি নামে একটি ছোট নদীও হুগলি নদীর সঙ্গে মিশেছে। ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে বয়ে আসা এই উপনদীগুলির অববাহিকার মোট ব্যপ্তি ৬৮,০৯৩ বর্গ কি.মি.। এর ৩১ শতাংশ এলাকা প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত। এই নদীগুলি মূলত বর্ষার জলে পুষ্ট হয়। ফলে ঝাড়খণ্ডের বা পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় নিম্নচাপজনিত অতিবর্ষণ হলে এইসব নদীতে বন্যা দেখা দেয়। ভেসে যায় গ্রামের পর গ্রাম, বিপর্যস্ত হয় কৃষি অর্থনীতি। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভয়াবহ বন্যায় রাজ্যের অর্থনীতির ক্ষতি হয়েছিল পাঁচ হাজার কোটি টাকারও বেশি। ২৩৫টি স্থানে রেলপথ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। অনেক স্থানেই ভেঙে গিয়েছিল রাজ্য ও জাতীয় সড়ক। গত তিন শতাব্দীতে ছোটনাগপুর ও সংলগ্ন রাঢ় বাংলার উচ্চভূমির বনাঞ্চল ব্যাপকভাবে ধ্বংস হয়েছে। ফলে বেড়েছে ভূমিক্ষয় এবং পলি জমে নদীখাত ক্রমশ অগভীর হয়ে গেছে। মজে গেছে প্রায় সব নদী। এছাড়া, নদীর বুক চিরে অনেক রেল ও সড়ক নির্মাণের পর জলপ্রবাহের স্বাভাবিক পথ সংকুচিত হয়েছে, বেড়েছে ভাঙন ও বন্যা। নদী ক্রমশ মজে যাওয়ার ফলে বিপন্ন হয়েছে মানুষের জীবন ও জীবিকা।

হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে ভাগীরথী তিনটি ধারায় বিভক্ত হত—পশ্চিমে সরস্বতী, পূর্বে যমুনা আর মাঝে ভাগীরথী। মধ্যযুগে সরস্বতী নদীর উপরেই গড়ে উঠেছিল সপ্তগ্রাম বন্দর। সরস্বতী, দক্ষিণ দিকে প্রায় ৭৭ কি.মি. পথ অতিক্রম করে আবার ভাগীরথী-হুগলি নদীতেই মিশেছে। আরও সুদূর অতীতে সরস্বতীর একটি ধারা চণ্ডীতলা, আমতা হয়ে কোলাঘাটের কাছে রূপনারায়ণের সঙ্গে মিশত। তখন দামোদর, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী ও কংসাবতীর সম্মিলিত জলস্রোত, বর্তমান রূপনারায়ণের মোহনা দিয়ে বয়ে যেত। আর এই ধারাটির তীরেই গড়ে উঠেছিল বন্দরনগরী তাম্রলিপ্ত। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে ৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বন্দরনগরী হিসাবে তাম্রলিপ্তের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। সরস্বতী মজে যাওয়ার পর প্রথমে তাম্রলিপ্ত ও পরে সপ্তগ্রাম বন্দরও নষ্ট হয়ে যায়।

মধ্যযুগীয় নৌ-বাণিজ্যে, আদিগঙ্গা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ। আদিগঙ্গা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ। আদিগঙ্গা খিদিরপুরের কাছে হুগলি নদী থেকে বেরিয়ে কালীঘাট, টালিগঞ্জ, গড়িয়া, সোনারপুর, জয়নগর, সূর্যপুর হয়ে সপ্তমুখী মোহনা দিয়ে সাগরে মিশত। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, আদি গঙ্গার দক্ষিণাংশ মজে গেলে কর্নেল টলি ১৭৭৫-৭৭ সালে খিদিরপুর থেকে গড়িয়া পর্যন্ত আদি গঙ্গার খাত সংস্কার করেন এবং পরে গড়িয়া থেকে শামুকপোতা পর্যন্ত একটি খাল কেটে আদি গঙ্গা ও বিদ্যাধরী নদীকে যুক্ত করে দেন। সেই সময় থেকে নদীটির নাম টলির নালা। মহাতীর্থ কালীঘাটের পাশ দিয়ে প্রবাহিত এই নদীটি হিন্দুদের চোখে পবিত্র, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই নদীপথেই নীলাচলে গিয়েছিলেন। সেই স্মৃতিও নদীটিকে বিশেষ কৌলিন্য দিয়েছে। কিন্তু আদি গঙ্গার জল এখন দূষিত। দক্ষিণ কলকাতা ও শহরতলির নোংরা জল মিশে নদীটি দূষিত হয়ে গেছে।

গত দুই শতাব্দীতে বাংলার নদী মানচিত্র অনেক বদলে গেছে। অনেক নদী হারিয়ে বা শুকিয়ে গেছে, অনেক নদী তাদের গতিপথ পরিবর্তন করেছে; কয়েক দশক আগেও যে সব নদী ছিল স্রোতস্বিনী, তাদের চলার পথ এখন কাঁকর-বালি-পাথরে বুজে গেছে। নৌ বাণিজ্যে যে সব বন্দরনগরীর খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া আজ তারা অবলুপ্ত। হারিয়ে গেছে তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম বা গঙ্গা বন্দর। বাংলার মধ্যযুগীয় রাজধানী গৌড় বা পাণ্ডুয়ার গা ঘেঁষে যে স্রোতস্বিনী নদী বয়ে যেত তা এখন আর নেই। নদীমাতৃক সেই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে গঙ্গা বা মহানন্দার প্লাবনভূমিতে।

নদীশাসন ও কৃষি অর্থনীতি

অতীতে বাংলার কৃষকরা বন্যার জল ও পলি ব্যবহার করতেন এক অসাধারণ দক্ষতায়। বন্যার জল দুকুল ছাপিয়ে প্লাবনভূমিতে নতুন পলি ছড়িয়ে দিত। দুই বা তিন দিন পর জল নেমে গেলে কৃষকরা সেই জমিতে বীজ ছড়িয়ে দিতেন—ধান, কলাই আরও কত কী! কোনো রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ছাড়াই প্রচুর ফসল ফলতো। অগ্রহায়ণে কৃষকরা মেতে উঠতেন নবান্ন উৎসবে।

জল, পলি ও প্লাবনভূমির এই আন্তঃসম্পর্কটিই ছিল বাংলার কৃষি-অর্থনীতির ভিত্তি। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকালে বাংলার নদী ও কৃষি ব্যবস্থার আন্তঃসম্পর্কটি ধীরে ধীরে বদলে যায়। ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশরা তৈরি করল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে তার একাংশ ব্রিটিশ রাজকে পৌঁছে দেওয়ার বরাত দেওয়া হল জমিদারদের। সেই সময় থেকেই শুরু হল বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করার এক ব্যাপক কর্মকাণ্ড। উত্তরবঙ্গ থেকে সুন্দরবন, সর্বত্র নদীর দুই পাড়ে মাটির বাঁধ দিয়ে বন্যার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হল। এই ব্যবস্থার ফলে প্রথম পর্যায়ে ছোট ব্যাপ্তির বন্যা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হল। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি ফল হল বিপ্রতীপ। বন্যার সময় যে পলি প্লাবনভূমিতে ছড়িয়ে যেত, সেই পলি নদীখাতে সঞ্চিত হতে থাকল। এছাড়া বৃষ্টির জল নদীখাতে গড়িয়ে যাওয়ার পথও বন্ধ হল। বড় বন্যার সময় একবার বাঁধ ভাঙলে বন্যার জল নদীখাতে ফিরে আসার পথ পায় না। অন্যদিকে, নদী তার স্বাভাবিক ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে 'শ্লথ' হয়ে গেল। ১৯২৭ সালে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখেছিলেন—পাড়বাঁধ বা এমব্যাঙ্কমেন্ট সাময়িকভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করলেও নদীখাতে পলিসঞ্চয় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। ১৯৩০ সালে প্রখ্যাত সেচ বিশেষজ্ঞ স্যার উইলিয়াম উইলকক্স্ দামোদরের বাঁধকে 'শয়তানের শৃঙ্খল' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। ১৯৪২ সালে অবিভক্ত বাংলার মুখ্য বাস্তুকার সুবোধচন্দ্র মজুমদার বলেছিলেন, এমব্যাঙ্কমেন্ট বা পাড়বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের অর্থ হল ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বন্ধক রেখে বর্তমান প্রজন্মের স্বার্থসিদ্ধি করা। নদীশাসনের এই ঔপনিবেশিক ধারা আজও অব্যাহত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের নদীর পাড় ধরে নির্মিত প্রায় ১০,৫৫০ কি.মি.

দীর্ঘ এমব্যাঙ্কমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করে রাজ্য সেচ দপ্তর। এ কথা সত্য যে, এই বাঁধগুলি ভেঙে ফেলে নদীকে মুক্ত করে দেওয়া এখনই সম্ভব নয়, কারণ পার্শ্ববর্তী গ্রাম-শহরের বসতি বিপন্ন হবে। তবে পরিকল্পিতভাবে প্লাবনভূমির বিভিন্ন অংশে পর্যায়ক্রমে বন্যার জল ও পলি ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। তাতে একাধারে নদী গভীর হবে, কৃষিজমিও নতুন পলিতে ফিরে পাবে হারানো উর্বরতা। তবে, এ জন্য প্রয়োজন একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা।

শুধু এমব্যাঙ্কমেন্ট বা পাড়বাঁধ নয়, নদী মরে যাওয়ার নেপথ্যে রয়েছে আরও অনেক কারণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় রেল ও সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হল। মূল লক্ষ্য ছিল বাংলার কাঁচামাল দ্রুত কলকাতা বন্দর হয়ে ইংল্যান্ডে পৌঁছে দেওয়া এবং সেখান থেকে উৎপাদিত দ্রব্য ফিরিয়ে এনে এদেশের বাজারে বিক্রি করা। অর্থাৎ, বাংলা তখন একাধারে কাঁচামালের উৎস ও বাজার। নদী বিষেশজ্ঞ স্যার আর্থার কটন বুঝেছিলেন যে, রেল ও সড়ক পথ জলের নিকাশি পথকে ব্যাহত করবে—তাই নদীপথে বাণিজ্য করাই কাম্য। কিন্তু ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নেন, যে শুধু বাণিজ্যিক স্বার্থে নয়, বিদ্রোহ দমনে ও সৈন্যবাহিনীর দ্রুত যাতায়াতের জন্যও প্রয়োজন রেল ও সড়ক পথ। জঙ্গলমহলের শাল গাছ নির্বিচারে কেটে তৈরি হল রেলের স্লিপার। সেই ধারা অব্যাহত ছিল স্বাধীনতা লাভের পরও। ১৯৫৩ সালে জমিদারী প্রথা বিলোপের পর জমিদাররা অনেক গাছ কেটে বিক্রি করার পর সরকারকে জমি হস্তান্তর করেছিলেন। ফলে ধীরে ধীরে বদলে গেছে বাংলার রূপরেখা, বেড়েছে ভূমিক্ষয় ও নদীতে পলি সঞ্চয়ের পরিমাণ।

এখানেই শেষ নয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে ওপার বাংলা থেকে আসা অবিরাম উদ্বাস্তু স্রোত এবং জনসংখ্যার অপ্রতিহত বৃদ্ধির প্রথম ধাক্কা গিয়ে পড়ল কৃষিক্ষেত্রে। এত মানুষের জন্য চাই খাদ্য—এল নতুন বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক। এছাড়া, মাটির নিচ থেকে জল টেনে তোলার জন্য অগভীর ও গভীর নলকূপ। গত চার দশকে পশ্চিমবঙ্গের সেচের জলের ঘাটতি পূরণ করার চেষ্টা হয়েছে নানাভাবে। নদীগুলির বুক চিরে তৈরি জলাধার ও খালের নেটওয়ার্ক প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে পারেনি। সেচের জলের ঘাটতি পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে মাটির নিচের জলভাণ্ডার থেকে। এখন প্রতি বছর আটলক্ষাধিক গভীর ও অগভীর নলকূপ যত জল টেনে তোলে বর্ষায় অতটা পূরণ হয় না। রাজ্যের অনেক এলাকাতেই লাগাম ছাড়া ব্যবহারে রিক্ত হয়ে যাচ্ছে মাটির নীচের জলভাণ্ডার। মনে রাখতে হবে যে এই জলভাণ্ডার থেকেই এক অবিরাম জলপ্রবাহ শীত ও গ্রীষ্মের অনাবৃষ্টির সময় নদীকে সজীব রাখত। ১৯৭০-এর দশক থেকে উচ্চফলনশীল ধান চাষের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে জলের চাহিদা। বর্ষার জল দিঘি-পুকুরে সংরক্ষণ করার চিরায়িত সংস্কৃতি এখন চূড়ান্ত অবহেলিত। পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তনের ৬২ শতাংশ এলাকা কৃষিজমি আর সেই জমির প্রায় ৯০ শতাংশ এলাকায়

ধান চাষ করা হয়। তাই সীমাহীন শোষণে ক্রমশ আরও নিচে চলে যাচ্ছে মাটির নীচের জলভাণ্ডার—নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির ভারসাম্য। রাজ্যের ৮১টি ব্লকের ভৌমজলে আর্সেনিক এবং ৪৯টি ব্লকে ফ্লুওরাইডের বিষ। নদীর জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের ঘাটতি আর কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার আধিক্য। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে নদী জলের জীববৈচিত্র্যও। মানুষেরই অবিমৃষ্যকারিতায় দেখা দিচ্ছে সভ্যতার সংকট। এ যেন কালিদাসের মতো নিজে বসে থাকা ডালটির গোড়া কেটে ফেলার চেষ্টা।

সুন্দরবনের নদী

অসংখ্য নদী, নালা, খাড়ি এবং ৪২৬৭ বর্গ কি.মি. বিস্তৃত ম্যানগ্রোভ অরণ্য নিয়ে সুন্দরবন একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চল। পূর্বে ইছামতী-হাড়িয়াভাঙা, পশ্চিমে বড়তলা মোহনার মধ্যবর্তী ৯৬৩০ বর্গ কি.মি. এলাকা ভারতীয় সুন্দরবন নামে পরিচিত। এই সমগ্র সুন্দরবনের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গে এবং বাকি অংশ বাংলাদেশে অবস্থিত। ১৩টি বড় খাড়ি বা নদী সুন্দরবনের মধ্যে দিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে, এর মধ্যে ছটি ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। সপ্তমুখী, জামিরা, মাতলা, বঙ্গদুনি, গোসবা, হাড়িয়াভাঙা, মালঞ্চ, কুনগা, পুসুর, বাংগরা ও হরিণঘাটা সুন্দরবনের বিখ্যাত নদী বা খাড়ি। এছাড়াও রয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট নদী।

সমুদ্রের গড় জলস্তর থেকে সুন্দরবনের উচ্চতা মাত্র তিন মিটার। ভরা জোয়ারে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা ডুবে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে সুন্দরবনে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন ও কৃষিজমি বিস্তারের কাজ শুরু হয়। সেই সময় থেকে নদীর দুই পাড়ে বাঁধ তৈরি করে লবণাক্ত জল প্লাবনভূমিতে ঢোকার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে ব্যাহত হয় ব-দ্বীপ গঠনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। দুই পাড়ের বাঁধের মাঝের বন্দী নদী পলি জমে ক্রমশ উঁচু হয়ে ওঠে। এখন অনেক নদীই ভরা জোয়ারের সময় প্লাবন-ভূমির তুলনায় অন্তত দুই মিটার উঁচু দিয়ে বয়ে যায়। সুন্দরবনের নদী বাঁধের মোট দৈর্ঘ্য ৩৫০০ কি.মি.। একথা সত্যি যে, এই বাঁধগুলি জোয়ারের লবণাক্ত জল থেকে বসতি ও কৃষিজমিকে রক্ষা করে, অথচ একথাও ভুললে চলবে না যে, নদীর স্বাভাবিক ছন্দে মানুষের এই হস্তক্ষেপ সুন্দরবনের গতিশীল ভারসাম্যকে নষ্ট করে দিয়েছে।

উত্তরবঙ্গের নদী

গঙ্গা পশ্চিমবঙ্গকে অসমান দুই ভাগে ভাগ করেছে। দার্জিলিং থেকে মালদহ পর্যন্ত ছয়টি জেলা নিয়ে উত্তরবঙ্গ। মোট আয়তন ২১,৭৬৩ বর্গ কি.মি.। তিস্তা, জলঢাকা, তোর্সা ও মহানন্দা উত্তরবঙ্গের প্রধান্ নদী। এই নদীগুলির মধ্যে একমাত্র মহানন্দাই গঙ্গায় মিশেছে। বাকি নদীগুলি ব্রহ্মপুত্র বা যমুনার উপনদী। এই সব নদীগুলি সৃষ্টি হয়েছে হিমালয় থেকে—ভূটান, সিকিম বা দার্জিলিং-হিমালয় ঢাল থেকে। পাহাড় পেরিয়ে সমভূমিতে নেমে আসার পর নদীগুলির ঢাল কমেছে, খাত প্রশস্ত হয়েছে এবং

নদীর চলার পথ কাঁকর, বালি, পাথরে ভরে গেছে। শুখা মরশুমে অনেক নদী হেঁটে পার হওয়া যায়। আবার বর্ষার সেই নদীতেই দুকূল ছাপিয়ে বন্যা হয়। প্রায়ই দুপাশের গ্রাম ভেসে যায়। তখন নদী তার পাড় ভেঙে নতুন গতিপথ করে নিতে চায়। বিপন্ন হয় গ্রামের পর গ্রাম। উত্তরবঙ্গের সবকটি বড় নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। লক্ষণীয়, অনেক নদীরই উৎস এই রাজ্যের বাইরে আবার মোহনাও সীমান্তের ওপারে। ফলে মধ্যাংশ এই রাজ্যের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে নাগর, কুলিক, চিরামতী, ট্যঙ্গন, পুনর্ভবা, আত্রেয়ী ইত্যাদি নদীগুলি বাংলাদেশ থেকে এ রাজ্যে প্রবেশ করে আবার বাংলাদেশেই ঢুকে গেছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় বেশি। কিন্তু এই বৃষ্টিপাতের প্রায় ৮০ শতাংশ হয় বর্ষার চার মাসে। বাকি আট মাসে মাত্র ২০ শতাংশ বৃষ্টি হয়। ফলে নদীগুলি জলপ্রবাহের তারতম্য ঘটে।

সৌজন্যে: দুর্বার ভাবনা, সেপ্টেম্বর ২০১০